প্রতিধ্বনি the Echo
A Journal of Humanities & Social Science
Published by: Dept. of Bengali
Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: www.thecho.in

রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পে প্রান্তিক মানুষের জীবিকা বা পেশার একটি সমীক্ষা

প্রশান্ত দাস

Abstract

Every person is attached with some or other profession. Without profession we can't think our livelihood. The need of survival every individual have to join some profession first. In the ancient social condition profession was caste-centred. Profession-by-birth is the main source of economy. In spite of being middle-class centralization, the life style of the peripheral, subaltern human was artistically painted in Tagore's short story. In the last decade of nineteenth century when Tagore visits the Bengal country side with the responsibility of land-lordship, he meets various subaltern peripheral people with different professions. Defeating the barriers of social bindings, he gradually endears the subalterns. In the present essay subalterns are divided into three different groups according to their profession such as-- land and production related subalterns, domestic service related subalterns and other subaltern professionals. The present essay also studies the socio-economic condition and significance of contribution of all those three professionals in isolation.

সামাজিক কৌলিণ্যে উচ্চাসনে অধিষ্ঠিত হয়েও রবীন্দ্রনাথ কখনো নিম্নবিত্তের জীবনধারাকে এড়িয়ে যায়নি। নিম্নবিত্তের জীবনধারা সম্পর্কে তাঁর ছিল সজাগ দৃষ্টি। তাঁর ছোটগল্পের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে তা সহজেই অনুভূতি গ্রাহ্য হয়ে ওঠে। তাঁর গল্পে শুধুমাত্র মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্তের জীবনের ছবিই নয়- সামাজিক পদমর্যাদায় নিচু বা সাধারণ স্তরের জনগণ, পেশাগত দিক দিয়ে অধস্তন জনগোষ্ঠী, কর্তৃত্ব বা ক্ষমতার দিক থেকে গৌণ জনগোষ্ঠী, পুরুষতান্ত্রিকার দাপটে ক্ষত-বিক্ষত অধস্তন নারীগোষ্ঠী প্রভৃতি প্রান্তিক জনমানসের চিত্রও শিল্পীত রূপে চিত্রায়িত হয়েছে। তাছাড়া তাদের প্রতি তিনি উচ্চারণ করেছেন সহমর্মিতার বাণী এবং বাড়িয়ে দিয়েছেন তাঁর সহযোগের হাত। প্রান্তবাসী অন্ত্যজ মানুষজনের নানা মাত্রিক জীবন সংগ্রাম ও জীবন বাস্তবতার ছবিও অব্যর্থ ব্যঞ্জনায় তাঁর ছোটগল্পে শিল্পরূপ লাভ করেছে।

প্রত্যেক মানুষই কোনো না কোনো জীবিকা বা পেশার সাথে জড়িত। যদিও বর্তমান ডটকমের যুগে মানুষের জীবিকা বা পেশা এক অন্য মাত্রা পেয়েছে। তথাপি বহু প্রাচীনকাল থেকেই এর প্রবহমানতা লক্ষ করা যায় । প্রাচীন বৈদিক সমাজ ব্যবস্থায় জীবিকা বা পেশা ছিল বর্ণভিত্তিক। কৌলিক বৃত্তিই ছিল তখন মানুষের অর্থ উপার্জনের একমাত্র পথ। কিন্তু কালক্রমে সমাজ ব্যবস্থার আর্থ সামাজিক পরিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে এই বর্ণভিত্তিক পেশার মধ্যে আসে সার্বজনীনতা। যাই হোক, প্রত্যক মানুষই কোনো না কোনো পেশার

সাথে জড়িত এবং অস্তিত্ব রক্ষার মৌল তাগিদই এর মূল কারণ।

রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প মূলত মধ্যবিত্ত জীবন-কেন্দ্রিক হলেও সমাজের অন্ত্যজ প্রান্তিক নিম্নবিত্ত মানুষের চিত্রও শিল্পীত রূপে চিত্রিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের জন্ম কলকাতার এক বর্ধিষ্ণু সম্পন্ন পরিবারে। জোড়াসাঁকোর অভিজাত পরিবারে তথা বৃহৎ সাহিত্যিক-সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে বেড়ে উঠার কারণে সামাজিক অবস্থানগত বিভেদ সাধারণ মানুষের সঙ্গে তাঁর পরিচিতি ও ঘনিষ্ঠতার অন্তরায় হয়ে দাড়িয়েছিল। কিন্তু উনিশ শতকের শেষ দিকে জমিদারি দেখাশোনার দায়িত্ব নিয়ে রবীন্দ্রনাথ যখন পূর্ববঙ্গে যান তখন নানা শ্রেণির প্রান্তিক পেশাজীবী মানুষের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটে। সামাজিক বাধা অতিক্রম করে সহজেই তাঁর আত্মীয়তা গড়ে ওঠে চাষি, ক্ষেতমজুর, রায়ত, কোরফা প্রজা, ভৃত্য, মাঝি, তাঁতি, ফেরিওয়ালা, দোকানদার, ভিখারিণী, কামার, কুমোর, ছুতোর প্রভৃতি বিচিত্র বৃত্তিধারী প্রান্তিক মানুষজনের সঙ্গে। রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পে বিভিন্ন শ্রেণির মানুষের নানা জীবিকা বা পেশার সন্ধান পাওয়া যায়। জীবিকা বা পেশার ভিত্তিতে রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পের বিভিন্ন শ্রেণির প্রান্তিক মানুষজনদের কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করে অলোচনা করা যায়। যথা --

ক) ভূমি ও উৎপাদনভিত্তিক সামাজিক শ্রেণির অন্তর্গত প্রান্তিক মানুষের জীবিকা বা পেশা।
খ) পরিবারভিত্তিক কর্মজীবী শ্রেণির নানা জিবিকা বা পেশা।
গ) অপরাপর প্রান্তিক শ্রেণির নানা জীবিকা বা পেশা।

ভূমি ও উৎপাদনভিত্তিক সামাজিক শ্রেণির অন্তর্গত যে সকল প্রান্তিক বৃত্তিজীবী চরিত্রের সন্ধান রবীন্দ্র ছোটগল্পে পাওয়া যায় তার মধ্যে 'সমস্যাপূরণ' গল্পের অছিমদ্দি (চাষি) ও শাস্তি গল্পের দুখিরাম ও ছিদাম (কোরফা প্রজা) বিশেষভাবে উল্লেখ্য। 'সমস্যাপূরণ' গল্পের অছিমদ্দির জীবিকা চাষবাস। দরিদ্র মুসলমান প্রজা হলেও তার প্রকৃত স্বরূপ আমাদের কাছে প্রকট হয় গল্পের পরিসমাপ্তিতে। প্রতিবাদী ভাষা নিয়ে সে জমদারি শাসনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছে। সামান্য প্রজা হয়ে কথা বলেছে তার হর্তাকর্তা-বিধাতার বিরুদ্ধে। যদি প্রশ্ন আসে- প্রতিবাদের বাণী উচ্চারণ করার জন্য যে প্রাণবায়ু দরকার তা অছিমদ্দি পেল কোথায়? উত্তরে প্রতিধ্বনিত হবে - ঔপনিবেশিক শাসন ব্যবস্থার রথচক্রে পিষ্ট কৃষকশ্রেণির হৃদয়যন্ত্রণাই এর ইন্ধনশক্তি। তার প্রতিবাদী স্বর কৃষক শ্রেণির প্রতিনিধিত্বের বাণী স্বরূপ।

'সমস্যাপূরণ' গল্পে চিত্রিত হয়েছে জমদারি প্রথার নগ্ন রূপ। বিপিনবিহারী প্রজাপীড়ক, স্বার্থান্বেষী, পিশাচ, অর্থগৃধু। নিরীহ প্রজাবর্গের উপর শোষণ প্রক্রিয়া চালানোই তার ধর্ম। কৃষ্ণগোপালকে দেওয়া চিঠিতে তা স্পষ্ট রূপে প্রতিভাত হয়ে ওঠে - "পূর্বে যেমন দান করা যাইত তেমনি পাওনা নানা প্রকারের ছিল। তখন জমিদার এবং প্রজা উভয় পক্ষের মধ্যেই দান প্রতিদান ছিল। সম্প্রতি নূতন নূতন আইন হইয়া ন্যায্য খাজনা ছাড়া অন্য পাঁচ রকম পাওনা একেবারে বন্ধ হইয়াছে এবং কেবলমাত্র খাজনা আদায় করা ছাড়া জমিদারের অন্যান্য গৌরবজনক অধিকারও উঠিয়া গিয়াছে - অতএব এখনকার দিনে যদি আমি আমার ন্যায্য পাওনার দিকে কঠিন দৃষ্টি না রাখি তবে আর থাকে কী। এখন প্রজাও আমাকে অতিরিক্ত কিছু দিবে না, আমিও তাহাকে অতিরিক্ত কিছু দিব না - এখন আমাদের মধ্যে কেবলমাত্র দেনাপাওনার সম্পর্ক। দানখয়রাত করিতে গেলে ফতুর হইতে হইবে, বিষয় রক্ষা এবং কুলসম্ভ্রম রক্ষা করা দুরূহ হইয়া পড়িবে। (সমস্যাপূরণ, গল্পগুচ্ছ, বিশ্বভারতী, পৃঃ ১৭৭-১৭৮) 'সমস্যাপূরণ' গল্পে রবীন্দ্রনাথ প্রান্তিক অন্ত্যজ জীবিকার অধিকারী কৃষকশ্রেণির উপর জমিদারি ব্যবস্থার শোষণের পাশাপাশি প্রতিবাদের চিত্রও অসামান্য ব্যঞ্জনায় উপস্থাপন করেছেন। একজন প্রান্তিক অন্ত্যজ জীবিকার

অধিকারী মানুষ কীভাবে তার প্রভুর বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ ঘোষণা করতে পারে তা এই অছিমদ্দি চরিত্রের মাধ্যমে দেখানো হয়েছে। অছিমদ্দি শোষিত নির্যাতিত, দলিত, অন্ত্যজ, প্রান্তিক মানুষের প্রতিনিধি। তার মধ্যে বঞ্চনাজাত ক্ষোভ ও অধিকারবোধ প্রবল। জমির সঙ্গে তার আত্মিক সংযোগ রয়েছে। বহুদিন ধরে নিষ্কর জমির স্বত্ব ভোগ করে আসার ফলে জমির উপর তার একধরনের দাখিলস্বত্ব প্রতিষ্ঠিত। আর এই অধিকারের এক তিলও সে ছেড়ে দিতে রাজি নয়। জমিদারতন্ত্রের বিরুদ্ধে এমন সরব প্রতিবাদ এর আগে রবীন্দ্রনাথের গল্পে বিশেষ দেখা যায়না। অছিমদ্দি সমর্থক চরিত্র। মহাজন কর্তৃক ডিক্রি জারি করে তার সর্বস্ব নিলামে তুললেও তার প্রতিবাদের ভাষা নিস্তেজ হয়নি। জমিদারি ব্যবস্থার চাপে পড়ে তথা জমিদার ও মহাজনদের শোষণযন্ত্রে পিষ্ট হয়েও গ্রামবাংলার প্রান্তিক অন্ত্যজ কৃষকশ্রেণি কীভাবে নিজের অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখার সংগ্রাম চালায়, অছিমদ্দি তার জ্বলন্ত নিদর্শন।

অন্যদিকে 'শাস্তি' গল্পের রুই ভ্রাতৃদ্বয় ভূমিহীন ক্ষেতমজুর । তারা রামলোচন চক্রবর্তীর 'কোরফা প্রজা'। কোরফা প্রজা শব্দদ্বয়ের অর্থ রায়তের অধীন রায়ত। যে সব প্রজা অন্য প্রজাদের নিকট থেকে জমি ভাড়া নিয়ে চাষ করে জীবিকা নির্বাহ করে তাদেরকে বলা হয় কোরফা প্রজা। জমির উপর এই কোরফা প্রজাদের কোনো অধিকার থাকে না। অপরদিকে ভূমির মালিক জমিদারের কাছেও তারা কোনো স্বীকৃতি পায় না। জমিদারের ইচ্ছা অনিচ্ছার উপর এই কোরফা প্রজাদের চলতে হয়। আমাদের আলোচ্য 'শাস্তি' গল্পের দুখিরাম ও ছিদামকেও জমিদারের ইচ্ছাতেই চলতে হয়েছে। জমিদারের নির্দেশেই পেয়াদারা তাদেরকে ধরে নিয়ে যায় কাছারিতে ঘর মেরামত করার জন্য। জমিদারের নির্দেশেই তাদের সারাদিন বেগার খাটতে হয়েছে। গল্পে জমিদারি বেগার প্রথার নির্মম ছবি অঙ্কিত হয়েছে এভাবে - 'বর্ষার চর ভাসাইয়া যাইবার পূর্বেই ধান কাটিয়া লইবার জন্য দেশের দরিদ্র লোক মাত্রেই কেহ বা নিজের খেতে কেহ বা পাট কাটিতে নিযুক্ত হইয়াছে; কেবল কাছারি হইতে পেয়াদা আসিয়া এই দুই ভাইকে জবরদস্তি করিয়া ধরিয়া লইয়া গেল। কাছারি ঘরে চাল ভেদ করিয়া স্থানে স্থানে জল পরিতেছিল তাহাই সারিয়া দিতে এবং গোটাকতক ঝাঁপ নির্মাণ করিতে তাহারা সমস্ত দিন খাটিয়াছে। বাড়ি আসিতে পায় নাই, কাছারি হইতেই কিঞ্চিত জলপান খাইয়াছে। মধ্যে মধ্যে বৃষ্টিতে ভিজিতেও হইয়াছে - উচিৎমত পাওনা মজুরি পায় নাই এবং তাহার পরিবর্তে যে সকল অন্যায় কটু কথা শুনিতে হইয়াছে সে তাহাদের পাওনার অনেক অতিরিক্ত।' (শাস্তি, গল্পগুচ্ছ, বিশ্বভারতী, পৃঃ ১৫৪-১৫৫)

জমিদারি শাসন ব্যবস্থায় শুধু জমিদার নন, তৎসঙ্গে মধ্যস্বত্বভোগী রামলোচন চক্রবর্তীর মতো অসংখ্য রক্তপিপাসু কীভাবে প্রজাদের রক্তশোষণ করতো তাও তিনি এই গল্পে ফুটিয়ে তুলেছেন। 'শাস্তি' ও 'সমস্যাপূরণ' গল্পের মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথ হতভাগ্য এই প্রজাবর্গের দুরবস্থার চিত্র অঙ্কিত করে আমাদের আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন ঔপনিবেশিক শাসন ব্যবস্থার রথচক্রে পিষ্ট অন্ত্যজ প্রান্তিক জীবিকাধারী এই সব ক্ষেতমজুর, চাষি, কোরফা প্রজাদের সত্যরূপ।

রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পে ভূমি ও উৎপাদনভিত্তিক সামাজিক শ্রেণির অন্তর্গত প্রান্তিক মানুষের জীবিকা বা পেশার যেমন সন্ধান পাওয়া যায় তেমনি পরিবারভিত্তিক কর্মজীবী শ্রেণির নানা জীবিকা বা পেশার অধিকারী চরিত্রের সন্ধানও পাওয়া যায়। নিম্নে তাদের একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা দেওয়া হলো ---

ক্রমিক নং	জীবিকা বা পেশা	চরিত্রের নাম	গল্পের নাম
		ক) কানাই	সে গ্রন্থের- ১৩ অধ্যায়
		খ) গণেশ	ঠাকুরদা
		গ) গুরুচরণ	জীবিত ও মৃত
		ঘ) তুলসী	মাল্যদান
		ঙ) দেওকিনন্দন	দুরাশা
		চ) নটবিহারী	রাসমণির ছেলে
		ছ) পুটে	সদর ও অন্দর
		জ)বনমালী	সে গ্রন্থের চার অধ্যায়
		ঝ)বিধু	জীবিত ও মৃত
		ঞ) ব্রজ	নষ্টনীড়
		ট) ভুতো	গল্পসল্প-র 'বিজ্ঞানী' গল্প
		ঠ) রতিকান্ত	মাস্টার মশায়
		ড) রহমত আলি	দালিয়া
		ঢ) রাইচরণ	খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন
		ণ) রামচরণ	কর্মফল
		ত) রামচরণ	হালদারগোষ্ঠী
		থ)শম্ভু	শেষের রাত্রি
		দ) পরেশ	নষ্টনীড়
২।	বেহারা	ক) অযোধ্যা	পয়লা নম্বর
		খ) সুখন	ল্যাবরেটরি
		গ) বচ্চু	রবিবার
৩।	মালী	ক) ধনা	মাল্যদান
৪।	পাচিকা	ক) নিস্তারিণী	বোষ্টমী
৫।	ঝি	ক) প্যারী	উলুখড়ের বিপদ
৬।	দাসী	ক) মঞ্জরী	জয়পরাজয়
		খ) মোক্ষদা	অনধিকার প্রবেশ
		গ)যশোদা	খাতা
		ঘ) সুধামুখী	মানভঞ্জন
৭।	খাসনামা	ক) মোবারক	ল্যাবরেটরি
৮।	পরিচারিকা	ক) রতন	পোস্টমাস্টার

পরিবারভিত্তিক কর্মজীবী শ্রেণির অন্তর্গত উক্ত তালিকাভুক্ত যে জীবিকা বা পেশার অধিকারী মানুষের সন্ধান রবীন্দ্র ছোটগল্পে পাওয়া যায় তারা সকলেই সমান গুরুত্ব পায়নি। কোনো

কোনো ক্ষেত্রে এই অন্ত্যজ জীবিকার অধিকারী মানুষদের শুধুমাত্র গল্পে উল্লেখ আছে, আখ্যানে বিশেষ গুরুত্ব নেই। তবে এই প্রান্তিক জীবিকাধারী নানা চরিত্র কোনো কোনো গল্পে প্রধান চরিত্র রূপেও চিত্রিত হয়েছে। যেমন রবীন্দ্রনাথের পাঠক মাত্রেই তাঁর রচিত 'পোস্টমাস্টার' গল্পের রতন চরিত্রের সঙ্গে পরিচিত। বারো-তেরো বৎসরের এই মেয়েটি পোস্টমাস্টারের পরিচারিকা। নারীসত্তার এক গুরুত্বপূর্ণ স্তরে এই চরিত্রের বিচিত্র মানসিক বিকাশ অবশ্যম্ভাবী না হলেও শিল্প সার্থকতা লাভ করেছে। তার সেবিকা সত্তাটি একদিকে যেমন তাকে নিয়ে মাতৃত্বের দিকে যাত্রা করে তেমনি অভিমানী নারীর গূঢ় অন্তরসত্তাটি সেই যাত্রার দিকবদল ঘটিয়েছে।

শুধু পোস্টমাস্টার গল্পের পরিচারিকা রতন নয়, 'খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন' গল্পের রাইচরণও আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বাংলা সাহিত্যে রাইচরণের মতো চরিত্র দ্বিতীয়টি পাওয়া কষ্টকর। জীবিকার তাগিদে সে কর্তার উপর নির্ভরশীল হলেও আত্মসম্মানের উপর আসা আঘাতকে সে সহ্য করতে পারেনি। গল্পের পরিসমাপ্তিতে নিজের সন্তানকে অন্যের হাতে তুলে দিয়ে যন্ত্রণায় অধীর হয়েছে রাইচরণ। কিন্তু কারো পথে বাধা হয়ে থাকেনি আত্মমর্যাদাবোধ সম্পন্ন এই ভৃত্য। তাই 'মাসান্তে অনুকূল যখন তাহার দেশের ঠিকানায় কিঞ্চিত বৃত্তি পাঠাইলেন তখন সে টাকা ফিরিয়া আসিল। সেখানে কোনো লোক নাই।' (খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন,গল্পগুচ্ছ, বিশ্বভারতী, পৃঃ৪১) পরিবারের ভৃত্য হয়েও রাইচরণ এই গল্পের কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থান করেছে। রবীন্দ্রনাথের এই চরিত্রের সঙ্গে তাঁর প্রিয় ভৃত্যের (বনমালির) সাদৃশ্য অনেকাংশে বর্তমান বলে মনে হয়। তাছাড়া 'পুরাতন ভৃত্য' কবিতার সাথেও এই গল্পের অনেকাংশেই ভাবসাদৃশ্য প্রত্যক্ষগোচর হয়। 'পুরাতন ভৃত্য' কবিতার কেষ্টাই যেন গল্পের রাইচরণ হয়ে উঠেছে । যে পুরাতন ভৃত্য শত তিরস্কারের পরও প্রভুর সঙ্গ ত্যাগ করেনি বরং প্রভুর সেবায় উৎসর্গ করেছে আপন জীবন । কয়েকটি পঙক্তি উদ্ধৃতির লোভ সামলানো গেল না –

" মুখে দেয় জল, শুধায় কুশল, শিরে দেয় মোর হাত,
দাঁড়ায়ে নিঝুম, চোখে নাই ঘুম, মুখে নাই তার ভাত।
বলে বার বার, 'কর্তা, তোমার কোনো ভয় নাই, শুন–
যাবে দেশে ফিরে, মাঠাকুরানীরে দেখিতে পাবে পুন।'
লভিয়া আরাম আমি উঠিলাম, তাহারে ধরিল জ্বরে;
নিল সে আমার কালব্যাধিভার আপনার দেহ'পর।
হয়ে জ্ঞানহীন কাটিল দু'দিন, বন্ধ হইল নাড়ী -
এতবার তারে গেনু ছাড়াবারে, এতদিনে গেল ছাড়ি।
বহুদিন পরে আপনার ঘরে ফিরিনু সারিয়া তীর্থ।
আজ সাথে নেই চিরসাথি সেই মোর পুরাতন ভৃত্য।।"

আলোচ্য গল্পে রাইচরণও তার জীবনের চেয়ে পরম ধন স্নেহের পুত্তলিকে তুলে দিয়েছে আপন প্রভুর হাতে। যা আমাদের হৃদয়কে ছুঁয়ে যায়। ভৃত্যের বাইরেও নারীপুরুষকে নিরীক্ষণ করেছেন রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবনে। 'সাহিত্যের পথে' থেকে একটি উদাহরণ দিলে বিষয়টি আরো স্পষ্ট হবে – " ছিলেম মফঃস্বলে, সেখানে আমার এক চাকর ছিল, তার বুদ্ধি বা চেহারা লক্ষ্য করবার যোগ্য ছিল না। রাত্রে বাড়ি চলে যায়, সকালে এসে ঝাড়ন কাঁধে কাজকর্ম করে। তার প্রধান গুণ, সে কথা বেশি বলে না। সে যে আছে সে তথ্যটা অনুভব করলুম যেদিন সে হল অনুপস্থিত। সকালে দেখি, স্নানের জল তোলা হয়নি, ঝাড়পোঁছ বন্ধ। এল বেলা দশটার কাছাকাছি । বেশ একটু রূঢ়স্বরে জিজ্ঞাসা করলুম, 'কোথায় ছিলি'। সে বলল, ' আমার মেয়েটি মারা

গেছে কাল রাতে। বুকটা ধক ক'রে উঠল। ভৃত্যরূপে যে ছিল প্রয়োজনীয়তার আবরণে ঢাকা, তার আবরণ উঠে গেল; মেয়ের বাপ বলে তাকে দেখলুম, আমার সঙ্গে তার স্বরূপের মিল হয়ে গেল, সে হলো প্রত্যক্ষ, সে হলো বিশেষ।" ('সাহিত্যের পথে, রবীন্দ্র রচনাবলী, দ্বাদশ খণ্ড, বিশ্বভারতী, পৃঃ ৪৮১) নিজের ভৃত্যের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ একাত্মতার অনুভবের মানসিকতায় রাইচরণ তথা পরিবারভিত্তিক কর্মজীবী শ্রেণির সকল চরিত্রগুলি আমাদের সামনে নবরূপে উদভাসিত হয়। এইসব মানুষ সম্পর্কে রবীন্দ্র মানসিকতাও আমরা খুব সহজেই অনুভব করতে পারি।

ভূমি ও উৎপাদনভিত্তিক সামাজিক শ্রেণি এবং পরিবারভিত্তিক কর্মজীবী প্রান্তিক মানুষের পাশাপাশি অপরাপর প্রান্তিক অন্ত্যজ মানুষ তথা – জেলে, তাঁতি, মাঝি, ডোম, কেরানি, মেথর, বিচিত্র বৃত্তিধারী মানুষের সন্ধান রবীন্দ্র ছোটগল্পে পাওয়া যায়। যেমন – 'হালদারগোষ্ঠী' গল্পের মধু কৈবর্ত একজন জেলে। এই গল্পে যে অর্থনৈতিক শোষণচিত্র বর্ণিত হয়েছে তা অনেকাংশেই বাস্তবমণ্ডিত হয়ে উঠেছে জেলে বৃত্তিধারী মধু কৈবর্তের জীবনের ট্র্যাজিক পরিসমাপ্তিতে। কিন্তু মধু কৈবর্তের প্রতি বনোয়ারীলালের অকৃত্রিম সহানুভূতি থাকা সত্ত্বেও এই প্রান্তিক জীবিকাধারী মানুষ প্রতিবাদের ভাষা খুঁজে পায়নি। সমাজের তলের তল এই বৃত্তিধারী মানুষ রবীন্দ্র গল্পে সংখ্যাগত দিক দিয়ে কম উপস্থিত থাকলেও এই দুই-একটি চরিত্রের মাধ্যমে তাদের সমগ্র শ্রেণির আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতি আমাদের সামনে ছবির মতো ফুটিয়ে তুলেছেন লেখক।

'হালদারগোষ্ঠী' গল্পের মতো 'মেঘ ও রৌদ্র' গল্পেও পরোক্ষভাবে উঠে এসেছে প্রান্তিক জীবিকাধারী এই জেলেদের প্রসঙ্গ। গল্পে জেলার পুলিশ সুপারিন্টেডেন্ট বাহাদুর চারজন জেলেকে হাতের কাছে না পেয়ে ক্রোধে অগ্নিশর্মা হয়ে ওঠে। অবশেষে পুলিশ সাহেবের কনস্টেবল পলাতক জেলেদের না পেয়ে তাদের চারজন মল্লাকে ধরে নিয়ে আসে। এই ঘটনাবর্তেই স্পস্ট হয়ে উঠে ঔপনিবেশিক শাসন ব্যবস্থায় ব্যতিব্যস্ত এইসব মানুষদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা। অপরদিকে 'পণরক্ষা' গল্পে বংশীবদন একজন তাতী। বংশীবদনের ট্র্যাজিক পরিণতিতে পাঠকচিত্ত ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে। এই গল্পে অর্থনৈতিক সংকটে পীড়নক্লিষ্ট প্রান্তিক অন্ত্যজ তাঁতি জীবিকাধারী মানুষের নির্মম পরিণতি রবীন্দ্রনাথ তুলে ধরেছেন অতিশয় নিষ্ঠা ও সহানুভূতির সঙ্গে।

এইসব জেলে, তাঁতি ছাড়াও রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পে – 'সমাপ্তি' গল্পের মাঝি চরিত্র বনমালী, 'সংস্কার' গল্পের বৃদ্ধ মেথর, 'মেঘ ও রৌদ্র' গল্পের জনৈক মেথর, 'সমাপ্তি' গল্পের দরিদ্র কেরানি ঈশান মজুমদার তথা মৃন্ময়ীর বাবা, 'অনধিকার প্রবেশ' ও 'সংস্কার' গল্পের ডোম প্রভৃতি বিচিত্র প্রান্তিক জীবিকার অধিকারী মানুষও স্থান করে নিয়েছে। প্রত্যেক ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ তাদের প্রতি উচ্চারণ করেছেন সহমর্মিতার বাণী এবং বাড়িয়ে দিয়েছেন তাঁর সহযোগের হাত। প্রান্তবাসী অন্ত্যজ জীবিকা ও পেশার অধিকারী এই মানুষজনের নানামাত্রিক জীবন ও জীবন বাস্তবতার ছবি অব্যর্থ ব্যঞ্জনায় তাঁর ছোটগল্পে শিল্পরূপ লাভ করেছে। তাছাড়া অনুভব করা যায়, চিন্তা ও প্রকাশের ক্ষেত্রে নিয়ত পরিবর্তনশীলতায় বিশ্বাসী রবীন্দ্রনাথ শুধুমাত্র সমাজের উচ্চশিখরেই সবসময় অবস্থান করেননি, সামাজিক বাধা অতিক্রম করে সহজেই তিনি মিলতে পেরেছিলেন সাধারণের সঙ্গে। সেইসঙ্গে সমাজের উঁচুতলার বাসিন্দা হয়েও প্রান্তিক অন্ত্যজ জীবিকা বা পেশার অধিকারী মানুষজনের প্রতি তাঁর মনোভাব সম্পর্কে আংশিক ধারণা পাওয়া যায় আলোচ্য পর্যালোচনায়।

সহায়ক গ্রন্থঃ

মিশ্র অশোক কুমার, *রবীন্দ্র ছোটগল্পের রূপরেখা*, দে'জ পাবলিশিং, প্রথম প্রকাশ - জানুয়ারি, ২০১২।
গুপ্ত ক্ষেত্র, *রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পে সমাজতত্ত্ব*, পুস্তক বিপণি, প্রথম প্রকাশ - মার্চ, ১৯৮৬।
সিংহরায় গোপীমোহন, *রবীন্দ্র সাহিত্যে নরনারী* (প্রথম খণ্ড), ভারবি, প্রথম প্রকাশ - জুলাই, ১৯৭২।
সিংহরায় গোপীমোহন, *রবীন্দ্র সাহিত্যে নরনারী* (দ্বিতীয় খণ্ড), ভারবি, প্রথম প্রকাশ - জুলাই, ১৯৭২।
বিশী প্রমথনাথ, *রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প*, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, প্রথম প্রকাশ - ভাদ্র ১৩৬১।
চৌধুরী ভীষ্মদেব (সম্পাদনা), *প্রভাতসূর্য* (রবীন্দ্রনাথ সার্ধশত জন্মবর্ষ স্মরণ),নবযুগ প্রকাশনী, প্রকাশ কাল - নভেম্বর, ২০১১।(দ্রঃ রবীন্দ্র ছোটগল্পে নিম্নবর্গ ,বিশ্বজিৎ ঘোষ, পৃঃ ৪২৬)।
দত্ত মৈত্রেয়ী, *রবীন্দ্র ছোটগল্পে সমাজ বাস্তবতা*, ভাষা, প্রথম প্রকাশ - জানুয়ারি, ২০০৭।
দেবসেন সুবোধ, *রবীন্দ্র সাহিত্যে ব্রাত্যসমাজ*, পুস্তক বিপণি, প্রথম প্রকাশ- জানুয়ারি,২০০০।

গবেষক, বাংলা বিভাগ, ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়, ত্রিপুরা